প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই -- সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে স্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ -- কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই।

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংযত ভাবের বিষয়ে কাথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে -- যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আধটা সভা -- যা কালেভদ্রে কারও বাড়িতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা বসত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত, তার খবর হত। এই-সকল দরবার সভাই আমাদের দেশের -- কি সব সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।'

প্রশ্ন -- এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

স্বামীজী -- এগুলো একটা অবনতি -- যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন বাঁচা,' আর গানের সময় 'হামবড়া' -- এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ -- ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সভ্যতা self-sacrifice-এর গোড়া।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন: বাপ-মায়ের অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। 'গান গাওয়াটা বড় দোষ' -- ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন করে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। 'তামাক খাওয়াটা মহাপাপ' -- এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব অছে -- সে-সব ভাবের কোন রকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার জো নাই। তা হতে গেলে বাপ-মাদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুসভ্য নয়, তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কিনা -- এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয়, আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। আর সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব (দাস্যভাব) সাধন করা চাই, নির্ভর চাই -- হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে -- তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত কোন লেখক -- তাঁহার কোন পুস্তকে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:

তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে তারা বিশ্বাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করেছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে, সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু করে ফেললি, তাঁকে ছোট করে ফেললি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান হন তো যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই তো ডাকছে। তবে সবাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই তোর কথা তারা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস, তবে মাথা নিতে পারবি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন:

বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না; তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই, নেই। সে-ভাব ঢের খুঁজে দেখছি, একটা বই দুটো দেখতে পাইনি।

প্রশ্ন -- কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী --এক G. C.-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তাঁর আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর? এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি।

এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।